বাংলা সাহিত্য কীভাবে শিবরামকে পেল তার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। একবার শিবরাম মাসিক দুই টাকা সুদে এক কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা কর্জ নিয়েছিলেন। প্রথম কিস্তির দুই টাকা কেটে কাবুলিওয়ালা তাঁকে আটচল্লিশ টাকা দিয়েছিলেন । এরপর থেকে সুদের টাকা জোগাড় করতে না পেরে বারংবার কাবুলিওয়ালার তাগাদার মুখে পড়েন শিবরাম। আর্থিক দুশ্চিন্তায় তিনি যখন জর্জরিত সেই সময়েই এক দৈনিকের সম্পাদক তাঁকে লেখালেখি শুরু করার পরামর্শ দেন। সম্পাদক তাঁকে বলেছিলেন যে এই লাইনে অর্থ ও যশ দুই প্রাপ্তিই ঘটবে তাঁর। এরপরই একটা লেখা লিখে শিবরাম সম্পাদকের দপ্তরে যান। লেখাটা নিয়ে সম্পাদক তাকে উৎসাহিত করার জন্য পাঁচটি টাকা হাতে দেন। তিন টাকা খরচের জন্য রেখে তিনি সেদিনই বাকি দুই টাকা দিয়ে কাবুলিওয়ালাকে সুদের কিস্তি মিটিয়েছিলেন। এরপর নানা লেখালেখি থেকে প্রাপ্ত টাকায় তিনি কাবুলিওয়ালার দেনা শোধ করেন

প্রায় আক্ষরিক অর্থেই ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ একা একাই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি। নিদারুণ অর্থাভাবে ও আরও বহুবিধ সমস্যায় ভুগেছেন। কিন্তু তাঁর লেখায় কোথাও নেই তিক্ততার স্বাদ। হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধনের গল্প শুনিয়ে বছরের পর বছর ছোট থেকে বড় সব বয়সের পাঠকের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। নিজের কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা নিজের বুকেই রেখে শত্রুহীন সবার প্রিয় চিরকুমার মানুষটি হাস্যরসের নির্ঝর বইয়ে দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে। তিনি শিবরাম চক্রবর্তী। ঠাট্টা করে বলতেন, ‘মুক্তারামে থাকা, তক্তারামে শোওয়া আর শক্তারামে ভক্ষণ’। কিন্তু দশকের পর দশক বিপুল জনপ্রিয় ওই হাস্যরসের কথাকারকে কি বাঙালি ভুলেই গেল। দিন কয়েক আগে ২৮ অগাস্ট তাঁর চল্লিশতম প্রয়াণ দিবস চলে গেল নীরবেই। এই বিস্মৃতি কি তাঁর পাওনা ছিল?

কেমন ছিল তাঁর জীবন– একটু ফিরে দেখা যাক। তিনি নেই, চার দশক হয়ে গেল। পা দেওয়া যাক শিবরামের সেই মেসের ঘরে। পিচ্ছিল পথ। নড়েচড়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেই একটা খোলা বারান্দা। পাশেই একফালি ঘর। বাইরে থেকে দরজাটা ভেজানো। চুন–সুরকির পলেস্তরা ঝরে পড়ছে চারদিকে। ভিতরে ঢুকলেই হতবাক হয়ে যেতে হবে। পেন্সিল বা কয়লার টুকরো দিয়ে হিজিবিজি লেখায় ভরে আছে চার দেওয়াল। সেখানে অজস্র নাম–ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর লেখা। ধুলোময় মেঝেতে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে ছেঁড়া চিঠি, দৈনিক ও সাময়িক পত্রপত্রিকা, বই, দড়ি, সিগারেটের প্যাকেটের রাংতা, ওষুধের প্যাকেট, কাগজের টুকরো ইত্যাদি ইত্যাদি। স্তূপীকৃত সেই জঞ্জাল ছাড়িয়ে একটু এগোলেই একটা তক্তপোষ। ছারপোকায় ভরা ওই তক্তপোষটির ওপর রাখা দু’টি ওয়াড়বিহীন কম্বল, মলিন একটা চাদর, তেল চিটচিটে একটা বালিশ। পাশাপাশি একটা হাতল ভাঙা চেয়ার। ছোট্ট একটা টেবিল। পাল্লাভাঙা একটা আলমারি। রং–ওঠা স্টিলের ট্রাঙ্ক। দেওয়ালকাটা তাকে বিক্ষিপ্তভাবে রাখা নানা সাইজের ওষুধভর্তি শিশি, ক্যাপসুল, ভিটামিন ট্যাবলেট, কাজুবাদাম, দুধের কৌটো, মাখন, টফি, লজেন্স প্রভৃতি। ছোট্ট এই ঘরটায় আরশোলা, ইঁদুর বা কাঁকড়াবিছেদেরও সহাবস্থান দেখলে আশ্চর্য হবেন না।

চোরাবাগান ও কলাবাগানের সংযোগস্থলে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে অবস্থিত এই মেসবাড়িটি। অবস্থান মনে রাখার জন্য সহজ একটা ছড়ার সাহায্য নেওয়া যায়। ‘এক দুই তিন চার/গুণে যান বার বার/বাদ দিন দ্বিতীয়কেই/ পেয়ে যাবেন তাহলেই।’ অর্থাৎ বাড়ির নম্বর হল ১৩৪। এই বাড়িতেই জীবনের অর্ধশতাব্দীকাল কাটিয়েছেন অকৃতদার শিবরাম চক্রবর্তী।

শিবরাম বা শিব্রামের একদিকে ছিলেন শিবের মতো আত্মভোলা, অন্যদিকে রামের ন্যায় প্রতিবাদী মানসিকতার মানুষ। সংসার ও সন্ন্যাস তাঁর জীবনে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আদ্যন্ত বোহেমিয়ান এই লেখকের তুলনা এখনও তিনি নিজেই। তামাটে রং, মাঝারি উচ্চতা, প্রশস্ত ললাট, ব্যাকব্রাশ করা চুল, নিখুঁত কামানো গাল আর চকচকে দু’টো চোখ। মুখে সর্বদা অমায়িক এক হাসি। দারিদ্র তার নিত্যসঙ্গী হলেও তাঁর পরনে থাকত দামি জামাকাপড়। সিল্কের ফুলহাতা ভাগলপুরি পাঞ্জাবি, ধবধবে সাদা শান্তিপুরি ধুতি। বুকে ফাউন্টেন পেন। বাঙালিয়ানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে শিবরামকে।

ইংরাজি ১৯০৩ সালে ১৩ ডিসেম্বর কলকাতায় নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটের দর্জিপাড়ায় দাদামশাইয়ের বাড়িতে জন্মেছিলেন শিবরাম। তাদের পৈতৃক নিবাস ছিল মালদার চাঁচলে। চাঁচলের রাজার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় স্বচ্ছলতার মধ্যেই শিবরামের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর পিতা শিবপ্রসাদ ছিলেন শিবপ্রেমী ও ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ। উত্তরাধিকার সূত্রেই তাই বিরাগী মন, দিলখোলা স্বভাবের অধিকারী হয়েছিলেন শিবরাম। তিনি নাকি জন্মেছিলেন খোলা হাতে। শিবপ্রসাদ তাই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন ‘এ ছেলে হবে সর্ববন্ধন মুক্ত জন্মসন্ন্যাসী। সর্বদা মুক্ত হস্ত, মুক্ত পুরুষ।’ শিবরাম তাঁর জীবনচর্চায় সেই মুক্তস্বভাবেরই স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তিনি ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’, ‘ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা’ কিংবা ‘ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর’ প্রভৃতি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে লিখে গিয়েছেন।

লেখালেখিকে পেশার ধরা–বাঁধা নিয়মে কোনওদিনই বাঁধেননি শিবরাম। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য লিখতে বাধ্য হতেন তিনি। লেখার প্রসঙ্গে শিবরাম বলতেন, ‘পড়াশোনার কোন পাট নেই আমার। লিখতে গেলে পড়া হয় না। পড়তে গেলে লেখা মাথায় ওঠে। তবে যাঁরা বদ্ধপরিকর লেখক হতে চান অবশ্যই তাঁরা পড়বেন।... কিন্তু আমার কথা আলাদা। আমি তো সত্যিকারের লেখক নই। হতেও চাইনি। এবং হতেও চাই না কোনদিন।’ পত্রপত্রিকাতে লেখা ছাপা হলে কী ধরনের অনুভূতি হয় – এক সাক্ষাৎকারে এর উত্তরে শিবরাম বলেছিলেন, ‘একটু আনন্দ হয় বইকি! আশা হয় যে এবার দক্ষিণাটা পাওয়া যাবে – যে কারণে আমার লেখাটা। অবিশ্যি আনন্দটা পুরো হয় দক্ষিণার টাকাটা হাতে পেলেই।’ কেন লেখেন? এই প্রশ্নের উত্তরও তিনি পরিহাসযোগেই দিয়েছিলেন। ‘রিকশাওয়ালা যেমন রিকশা না টানলে খেতে পাবে না, আমারও প্রায় সেই দশা। লেখকদের ভিতর আমি একজন মজুর, মেহনতি মানুষদের একজন।’

কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, শিশুদের জন্য লেখা – সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই অবাধে বিচরণ করেছেন শিবরাম। চাঁচলে থাকাকালীন ‘ভারতী’ পত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। ‘মানুষ’ ও ‘চুম্বন’ কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকায় অজস্র কবিতা লিখেছেন তিনি। কবিতা কিংবা গদ্যে জীবনবোধ, দর্শন, বাস্তবজ্ঞান, সর্বোপরি উপলব্ধির গভীরতাকে হাস্যকৌতুকের মোড়কে উদ্ভাসিত করেছেন। তাঁর যে কোনও গল্পই বড় কিংবা ছোটদের কাছে সমান উপভোগ্য হয়ে ওঠে। নিজেকে ক্লাউন হিসাবে পরিচয় দিয়ে শিবরাম লিখেছেন ‘সার্কাসের ক্লাউন যেমন সব খেলাতেই ওস্তাদ, কিন্তু তার দক্ষতা হল দক্ষযজ্ঞ ভাঙার। সব খেলাই সে জানে, সব খেলাই সে পারে। কিন্তু পারতে গিয়ে কোথাও কি হয়ে যায়, খেলাটা হাসিল হয় না, হাসির হয়ে ওঠে। আর হাসির হলেই তার খেলা হাসিল হয়।’ তাঁর গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল মানুষ আর মানুষ এবং বিষয়বস্তু ছিল জীবন–নির্ভর। ব্যক্তি বা পারিবারিক জীবনের তুচ্ছ অসংগতি বা স্খলন অতিরঞ্জন বা অসম্ভাব্যতার মিশেলে জারিত করে কখন পৌঁছে যায় হাস্যময় জীবনভূমিতে। কোনও তত্ত্বভাবনা ছাড়াই তারা নিরন্তর হাসির উপাদান যুগিয়ে যায় আমাদের। শিবরামের গল্পজগৎ জুড়ে থাকত মনোরম এক পারিবারিক আমেজ। গল্পের বুননে এসে পড়ত পিসি–পিসেমশাই, মাসি–মেসো, অপোগণ্ড ভাগ্নে–ভাগ্নির দল, প্রতিবেশীরা, নিকুঞ্জ কাকা, কাঞ্চন, আদরের বোন বিনি, জবা, ইতু ইত্যাদি। গল্পের কেন্দ্রে অবস্থান করতেন শিবরাম নিজেই। গল্পের উপাদান হিসাবে নিজের পোষা ছারপোকা দ্বারা জব্দ হওয়া (ঘটোৎকচ বধ), বাড়িতে চোর এলে তাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার অছিলায় – জরির সুতো দিয়ে থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলা (চোর চক্রবর্তী) – পাঁচশো টাকা পুরস্কারের লোভে বিজ্ঞাপন অফিসের অফিসারদের নিখোঁজ কুকুর খুঁজতে বেরিয়ে পড়া (শ্রীমতী ভেটো) – ইত্যাদি অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির চেহারাটিকে শিবরাম অনবদ্য কলমে তুলে ধরেছেন হর্ষবর্ধন–গোবর্ধনদের কীর্তিকাহিনির মাধ্যমে। শৈল চক্রবর্তীর পাকা তুলির টানে এদের দু’জনের চেহারা বাস্তবরূপ পেয়েছিল। একজন রীতিমতো হৃষ্টপুষ্ট, প্রায় গোলাকৃতি, জাঁদরেল গোঁফওয়ালা, অন্যজন সিড়িঙ্গে, প্যাঁকাটি মার্কা, খোঁচা খোঁচা চুল। যথাক্রমে হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন। এরা অসমের কাঠব্যবসায়ী, ধনকুবের, কলকাতায় এসেছে টাকা ওড়ানোর জন্য। হর্ষবর্ধনকে পাঠকের ফিউডাল ও ক্যাপিটালিস্ট চরিত্রের অদ্ভুত মিশেল মনে হতে পারে। একটা ‘ডাবল ডেকার’ বাসে উঠে কন্ডাকটরকে একশো টাকা ভাড়া দিয়ে হর্ষবর্ধন ভাবে ওই বাসটির মালিক তারাই – (হর্ষবর্ধনের বাসলীলা)। আবার জাদুঘরের মধ্যে সিগারেট খাওয়ায় হর্ষবর্ধনের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়। জরিমানাস্বরূপ গোবর্ধনের দেওয়া একশো টাকার ভাঙানি না মেলায় আর একটা সিগারেট খেয়ে ‘ডাবল’ জরিমানা দিয়ে ওরা ঝামেলা থেকে পরিত্রাণ পায়। শব্দচয়ন, সংলাপ, বিষয়বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে হাস্যরস পরিবেশনের মাধ্যমে পাঠককে সঞ্জীবনী সুধা পান করাতেন শিবরাম।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে শিবরামের ব্যঙ্গ–বিদ্রূপের মধ্যে শ্লেষ থাকলেও দ্বেষ থাকত না। তীক্ষ্ণ বীক্ষণের সঙ্গে মধুর পরিহাস তিনি গল্পে ছড়িয়ে দিতেন সংসারের নানা অকিঞ্চিৎকর সব পরিসরে। শিবরামের ভাষার প্রসাধনই হল ‘PUN’ অর্থাৎ একই উচ্চারণযুক্ত ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহারের সাহায্যে সৃষ্ট অলংকার। হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি PUNকে ব্যবহার করেছেন অনায়াস দক্ষতায়। এ জন্য অনেক ভাষাবোদ্ধা শিবরামকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ Pun star বলেছেন। শিবরাম নিজেও নিজেকে ‘পানাসক্ত’ অভিধা দিয়েছিলেন। শিবরামের লেখা অনুসরণ করে অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন (ক) তিনি বলেছিলেন, ‘মিলবে, আলবাৎ মিলবে। কিন্তু পরে দেখা গেল তা All–বাৎ (বাসের মধ্যে আবাস)’ (খ) ‘টাকার জন্য টেঁকা আর টেঁকার জন্য টাকা।’ (হাতি–মার্কা বরাত), (গ) ‘সবচেয়ে ভাবনার কথা ভাব না করার কথায় (কলকাতার হালচাল, প্রথম ধাক্কা)’ (ঘ) বাড়ির সঙ্গে আড়ি করে বাইরে যাওয়া বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়।’ (শাকলা–পাকলা)। শিবরামের Pun–এ আসে কিছু জোড়াশব্দ, যেগুলির মধ্যে পার্থক্য একটি ধ্বনির– ‘আমাকে বাঘে পেয়েছিল,